

শিক্ষার সঠিক আদর্শ ও লক্ষ্য চাই

কোচিং ও নোটবই

আবুল মোমেন

সরকার কোচিং-টিউশনি ও নোটবইয়ের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান থেকে পিছু হটে এল। শিক্ষামন্ত্রী এ নিয়ে প্রায় জিহাদে নেমেছিলেন, কিন্তু রাস্তাবতা বা তারও চেয়ে বেশি, নোটবই ও কোচিং ব্যবসায়ীদের চাপের মুখে নমনীয় হতে বাধ্য হলেন। বর্তমানে সংশোধিত যে খসড়া আইনটি মন্ত্রিপরিষদে গেছে, তার যেটুকু পত্রিকায় পড়েছি (প্রথম আলো, ৭ নভেম্বর ২০১৬), তাতে বোঝা গেল, এ আইনের আওতায় কোচিং, টিউশনি, নোটবই—সবই বহাল থাকবে। অর্থাৎ, কঠোর আইন করে এবং জিহাদ ঘোষণা করেও এগুলো বন্ধ করা যায়নি। যেসব কারণে আইন ও প্রচারণা সত্ত্বেও এসব বন্ধ করা যায়নি, তা বিবেচনায় নিয়েই ব্যবস্থা নিলে ভালো হতো।

সাধারণভাবে এ প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক যে একজন ছাত্রকে কেন তার পাঠের বিষয়গুলো বুঝতে পাঠ্যবই, শ্রেণিকক্ষের পাঠ ও বিদ্যায়তনের শিক্ষকের সহযোগিতার বাইরে আরও বাড়তি সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হবে? এটা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু আমাদের দেশে স্কুলশিক্ষা প্রবর্তনের আদিকাল থেকেই গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা ছিল। রবীন্দ্রনাথ ছেলবেলা বইতে তাঁর সেজদা ছাড়াও এস্তার গৃহশিক্ষকের বর্ণনা দিয়েছেন। গল্প-উপন্যাসেও আমরা গৃহশিক্ষকদের কথা পাই। তাঁরা সাধারণত গ্রাম থেকে শহরে উচ্চশিক্ষার জন্য এসে সম্পন্ন গৃহস্থবাড়িতে থেকে সে বাড়ির ছেলেমেয়েদের পড়ানোর বিনিময়ে থাকা-খাওয়ার সংস্থান করতেন ও নিজের পড়াশোনা চালিয়ে যেতেন, যা জায়গির নামে পরিচিত। উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুসমাজে আর বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে মুসলিম সমাজে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে। প্রশ্ন তোলা যায়, গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন হতো কেন? শুরুতে সমস্যাটা ছিল এ ধরনের আনুষ্ঠানিক, অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে অভিভাবকদের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাব। ফলে উচ্চতর শ্রেণির ছাত্ররা এ কাজে সহায়ক হতো এবং বিনিময়ে তাঁদেরও আবাসন ও আহাযের সংস্থান হতো। তা ছাড়া বিশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত শহরে খুব সীমিতসংখ্যক পরিবারের বসবাস ছিল, কর্তারা মেসে বাস করে জীবিকা নির্বাহে অথবা জীবন উপভোগে সময় ব্যয় করতেন। তাই গ্রাম থেকে এনে সন্তানকে কোনো গৃহস্থবাড়িতে থাকতে দিতেন। গ্রামীণ পরিবারে বহুকাল ধরেই স্কুলগামী শিশুরা ছিল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম প্রজন্ম। মা-বাবা তাদের দেখতালে অক্ষম ছিলেন এবং উপযুক্ত কাউকে, প্রায়ই নবীন কোনো শিক্ষককে, বাড়িতে থাকতে দিয়ে বা টাকার বিনিময়ে গৃহশিক্ষক হিসেবে রাখতেন।

গৃহশিক্ষকতা ব্যক্তির জন্য সাময়িক পেশা হলেও এ রকম কর্মপ্রাণীর নিত্যচাহিদা ও জোগান থাকায় এর একটা ধারাবাহিকতা এ সমাজে বরাবর ছিল। বলা যায়, এ পেশা আমাদের



সামাজিক সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।

বিষয়টা আমাদের দেশের ক্ষেত্রে জটিল ও বিশিষ্ট হয়ে উঠল এ কারণে যে, আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দুই শ বছর অভিজ্ঞত্ব হলেও আমাদের সমাজ শিক্ষা বা লেখাপড়া বা পঠনপাঠন কিংবা জ্ঞানার্জনে এর, অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও এতৎসংগঠিত ডিগ্রি, সনদ ইত্যাদির বাইরে জীবনের সঙ্গে যুক্ত বা জীবনে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে পারেনি। শিক্ষা এক জীবনব্যবস্থার প্রক্রিয়া, এর একমাত্র লক্ষ্য ও মোক্ষ হলো ডিগ্রি ও সনদ, জীবনকে তাৎপর্যময়, আনন্দময় করে তোলার রসদও যে এখান থেকেই আসবে; এখান থেকেই মানুষটার ভাবনার জগৎ, বিবেচনার বোধ ও ক্ষমতা, ধৈর্য, মমতা, সহিষ্ণুতা, ঊদার্য, সহানুভূতি, সেবাপরায়ণতা ইত্যাদি মানবিক গুণ অর্জিত হবে, তার ভাবনা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আর নেই। একসময় শিক্ষা মহৎ আদর্শ লালন করত, শিক্ষকেরা সে আদর্শের প্রতিভূ ছিলেন। এখন তাকে আমরা বেশি রকম বৈষয়িক বিবেচনায় বেঁধে ফেললাম।

এদিকে ছাত্রের শেষ করার পর কাউকে তো আর বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা দিতে হয় না, কিন্তু জীবনে পদে পদে বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, মানবিকতাসহ বিভিন্ন দক্ষতা ও মূল্যবোধের পরীক্ষা দিয়ে যেতে হয়। সেসব পরীক্ষায় যে আমরা ভালো করছি না, তা সমাজের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। এর দায় শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা এড়াতে পারে না।

পরীক্ষা, পাঠ্যবই ও সিলেবাস এবং জিপিএ ৫-কেন্দ্রিক যে শিক্ষা, তাতে কারও শিক্ষার্থীসত্ত্বে কোনো গুরুত্ব নেই, সমস্ত জোরটা গিয়ে পড়ে পরীক্ষার্থী হিসেবে তার দক্ষতার ওপর। স্কুল (এবং

অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান) পরীক্ষা ও পাঠ্যবইয়ের বাইরেও নানা বিষয়ে ছাত্রকে অবহিত, আগ্রহী ও দক্ষ করে তোলার কথা। সেখানে সে খেলবে, মিশবে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি করবে এবং স্কাউট-গাইড করবে, দেশ ও বিদেশের কথাও জানবে, কোনো কাজে যুক্ত হবে ইত্যাদি।

কিন্তু কী এক জাতিগত তাড়নায় সবাই বুঝছেন যে শিক্ষার লক্ষ্য হলো পরীক্ষায় ভালো ফল করা, জন্মে তা-ই একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। সেদিক থেকে স্কুলকে টেক্সা দিয়ে পরীক্ষার ফলার্জনের আর্থিক বাজারটি দখলে নিয়েছে কোচিং সেন্টার। স্কুলশিক্ষকেরা স্কুলে মনোযোগ না দিয়ে ব্যাচ পড়ানোর দিকে মন দিয়ে শিক্ষাবাজার থেকে মুনাফা নিচ্ছেন। আর জায়গির ও গৃহশিক্ষকতা যাঁদের গতি হতো, তাঁরা দল বেঁধে কোচিং সেন্টার দিয়ে শিক্ষাবাজারের সবচেয়ে সফল বণিকে পরিণত হয়েছেন। এখানে শিক্ষার্থীরা কেবল পরীক্ষা দেয়, ওরা বলে মডেল স্টেট। এভাবে ছাত্ররা দক্ষ, দুরন্ত পরীক্ষার্থীতে রূপান্তরিত হয়।

এভাবে তারা ভালো ফলও করে, কিন্তু বিনিময়ে অর্থ ছাড়াও আরও মূল্য দেয়, তা হলো তার পড়াশোনার ইচ্ছা, জ্ঞানার্জনের আগ্রহ, সেটা আদতে অঙ্কুরেই ধরে যায়, অবিকশিত থেকে যায়। সে সংবাদপত্র বা প্রচারপত্র ছাড়া আর কিছুই পড়তে পারে না। বই-পুস্তক পাঠে মনোযোগও দিতে পারে না, আনন্দও পায় না। আমরা এভাবে পাঠ্যবইয়ের বাছাই করা অংশের (কেননা, দক্ষ কোচ নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকুর প্রশ্নের উত্তর শেখান) ভাসা ভাসা ধারণা নিয়ে 'শিক্ষিত' জাতি গঠন করছি! আখেরে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের চকচকে সর্বাঙ্গ ডিগ্রি নিয়েও

অধুনা তরুণেরা না পারেন গুরু বাংলা, গুরু ইংরেজি লিখতে, না পারেন জাতির শ্রেষ্ঠ কৃতি সম্পর্কে বলতে কিংবা পারেন না বিখ্যাত মনীষীদের কথা বা জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে।

আমাদেরই ব্যবস্থার কারণে ছাত্র-অভিভাবক উভয়ের কাছেই স্কুলের চেয়ে কোচিং সেন্টারের গুরুত্ব বেড়ে গেছে। যেসব স্কুল ভালো ফল করছে, খোঁজ নিলে দেখা যাবে, তারাও কোচিংয়ের অনুরোধে সাপ্তাহিক, মাসিক, বিষয়ভিত্তিক অধ্যয়নভিত্তিক হরেক পরীক্ষার জালে ছাত্রদের বেঁধে রেখেছে। আইন দিয়ে এ ফলের লোভ আর পরীক্ষার মড়ক ঠেকানো যাবে না এবং এদের ছালানি নোটবইও বন্ধ হবে না। যদি শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হয় পরীক্ষা, তাহলে কেবল যে শিক্ষার উদ্দেশ্য সীমিত হয়ে পড়ল তা নয়, এই সংকীর্ণ কিন্তু লোভনীয় উদ্দেশ্যকে ঘিরে বাণিজ্য তৈরি হওয়া স্বাভাবিক, তৈরি করা সহজ। যদি ছাত্রের অন্যান্য বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক গুণাবলি-দক্ষতা অর্জনের দায়ও শিক্ষার ওপর থাকত, তবে কোচিং সেন্টার বা গৃহশিক্ষক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে টেক্সা দিতে পারত না।

আমি যে বিষয়টি এখানে বলতে চাইছি, তা কেবল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবেচ্য নয়, এটি হলো জাতি গঠনের প্রশ্ন। আমরা কি পরীক্ষা পাসের সংকীর্ণ মাপকাঠির ভিত্তিতেই জাতি গঠন করব, নাকি আরও ব্যাপ্ত পরিসরে মানুষকে বিবেচনায় নেব, সেটি আগে ঠিক করতে হবে। পরীক্ষা পাসই যদি মাপকাঠি হয়, তবে কোচিং-নোটবই ব্যবসা কখনো বন্ধ করা যাবে না। এটি জাতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

আমরা কি লক্ষ্য করছি, শিশুরা পালে পালে যেসব কোচিং সেন্টারে ছুটছে, সেগুলো একজাতের কারাগার, স্কুলগুলো হলো বন্দিশালা আর বাড়িগুলো বহুতল ভবনে খাঁচার মতো ঝুলে থাকে। আর মাঠ, অবসর, বন্ধুবান্ধব, যোগ্য নেতা, শিল্প-সংস্কৃতিচর্চা ছাড়া শিশুরা কেবল পরীক্ষার ঘানি টানছে। শৈশবের জন্য বড়দের কাছ থেকে একটু মায়া, একটু সহানুভূতি দরকার, ভাবনা দরকার, পরিকল্পনা চাই। সেটা দিতে আমরা বড় কার্পণ্য করছি। সোনার ডিম পাড়ার জন্য তৈরি হওয়ার আগেই হাঁসগুলোকে বন্ধ্যা করে দিচ্ছি।

প্রত্যেকের বাড়ির পরিবেশ ঠিক করা রাষ্ট্রের কাজ নয়, কিন্তু স্কুলের ভূমিকা ঠিক করা সম্ভব। তবে তার আগে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঠিক করতে হবে। জাতিগতভাবে আমাদের বুঝতে হবে যে পাঠ্যবইয়ের বাছাই অংশের নোট পড়ে শিক্ষিত জাতি গঠন এবং যথার্থ মানুষ তৈরি করা সম্ভব নয়। বরং এই বিকৃত শিক্ষার বাইরে থেকে হয়তো মানুষ হওয়া সম্ভব।

মূল জায়গাটা ঠিক করে স্কুলকে সেভাবে গড়ে তুললে আপনিই মানুষ কোচিং-নোটবইয়ের পেছনে কড়ি ঢালবে না, শ্রম দেবে না। আর তারপর শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্যটা শিশুদের জন্য আরও সজজনীল সব উপকরণ ও কাজের চ্যালেঞ্জ-ভিত্তিক হয়ে উঠবে, তাতে মেধাবীরা অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারবে। জাতি ও শিক্ষার নাভিস্তাস থেকে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে।

● আবুল মোমেন : কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক।